শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের জীবনী
ও
খেতুরীধাম মাহাত্ম্য

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য : শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের জীবনী

ও

খেতুরীধাম মাহাত্ম্য

প্রকাশক : শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে
প্রথম প্রকাশ : ১০,০০০ কপি
দ্বিতীয় প্রকাশ : ৫,০০০ কপি
তৃতীয় প্রকাশ : ১০,০০০ কপি
চতুর্থ প্রকাশ : ৫,০০০ কপি

ভক্তিবেদান্ত গীতা একাডেমী
স্বামীবাগ আশ্রম : ৭৯, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০।
ফোন : (০২) ৯৫১১৭৮১, ৭১২২৪৮৮
মোবাইল : ০১৯১৬৮২৩৬৯৭

শ্রী শ্রী নরোত্তম ঠাকুর

আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ব্বতীর্থদর্শী।
পরম ভাগবতোত্তম শ্রীল নরোত্তম দাস ॥

পদ্মাবতী নদীতটে গোপালপুর নগরে রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত বাস করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। দুই ভাইয়ের ঐশ্বর্য্য ও যশাদির তুলনা হয় না।

রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীনরোত্তম এবং শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র শ্রীসন্তোষ দত্ত। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রী নরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শুভলগ্নে পুত্রের জন্মে রাজা কৃষ্ণানন্দ আনন্দে বহু দান-দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণগণ লগ্ন দেখে বললেন পুত্র প্রসিদ্ধ মহান্ত হবে, এর প্রভাবে বহু লোক উদ্ধার হবে।

রাজপুরে দিন দিন শশীকলার ন্যায় শিশু বাড়তে লাগল। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গকান্তি, দীঘল নয়ন, আজানুলম্বিত ভুজ-যুগল ও গভীর নাভি,—মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ বর্ত্তমান। পুত্র দর্শনের জন্য রাজপুরে সর্ব্বদা লোকজনের সমাবেশ হত। ক্রমে অন্নপ্রাশন চূড়াকরণাদি হল। পুত্রের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ বহু দান-ধ্যান করলেন।

রাজা কৃষ্ণানন্দের পত্নীর নাম শ্রী নারায়ণী দেবী। তিনি অপূর্ব্ব পুত্র পেয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। তিনি শ্রী নারায়ণের কাছে সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন।

শিশু অতিশয় শান্ত জননী যেস্থানে রাখতেন সেখানে থাকতেন। অন্তঃপুরে রমণীগণ শিশুকে লালনপূর্ব্বক কত আনন্দ প্রাপ্ত হতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হলে তার হাতে খড়ি দিলেন। বালক যে বর্ণ একবার গুরু স্থানে শুনতেন তখনই তাহা কণ্ঠস্থ করতেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত হলেন। পন্ডিত স্থানে দর্শন শাস্ত্রাদি কিছু কাল অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু ভগবদ্ ভজন বিনা বিদ্যার কোন সার্থকতা হয় না ইহা বিশেষ অনুভব করলেন। পূর্ব্বে বহু বিদ্বান ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে শ্রীহরির উপাসনা করেছেন। শ্রী নরোত্তম দাসের মন দিনের পর দিন সংসারের প্রতি উদাসীন হতে লাগল। তিনি ভোগবিলাসে উদাসীন হলেন। এ সময় শ্রী গৌরসুন্দরের ও নিত্যানন্দের মহিমা ভক্তগণ মুখে শুনে হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে শ্রী নরোত্তম শ্রী গৌর-নিত্যানন্দের গুণে আকৃষ্ট হয়ে দিন রাত ঐ নাম জপ করতে লাগলেন। দয়াময় শ্রী গৌরসুন্দর সপার্ষদ একদিন স্বপ্নযোগে নরোত্তমকে দর্শন দিলেন।

অতঃপর কেমনে সংসার ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে যাবেন শ্রী নরোত্তম দিন রাত ভাবতে লাগলেন।

হরি! হরি ! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নয়নে নিরখিব যুগল রূপরাশি॥

এই বলে শ্রী নরোত্তম সর্ব্বদা গাইতে লাগলেন। বিষয়ের

প্রতি, ভোগ-বিলাসের প্রতি শ্রী নরোত্তমের বৈরাগ্য দেখে, রাজা কৃষ্ণানন্দ ও নারায়নী দেবী নানা চিন্তা করতে লাগলেন। পুত্র যাতে সংসার ত্যাগ করে যেতে না পারে তজ্জন্য কিছু লোক পাহারায় নিযুক্ত করলেন। শ্রী নরোত্তম দেখলেন দুর্গম বিষম পর্ব্বত অতিক্রম করে, তিনি বোধ হয় শ্রী গৌরসুন্দরের শ্রীচরণ ভজন ও শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেতে পারবেন না! নিরুপায়ভাবে কেবল শ্রী গৌর-নিত্যানন্দের কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গৌড়েশ্বরের লোক এসে রাজা কৃষ্ণানন্দকে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে বললেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম দত্ত দুই ভাই গৌড়-রাজ-দরবার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রী নরোত্তম সংসার-ত্যাগের ভাল সুযোগ পেল। তখন জননীর কাছ থেকে কোন প্রকারে বিদায় নিয়ে রক্ষক-লোকের অলক্ষ্যে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। কার্তিক পূর্ণিমায় শ্রী নরোত্তম সংসার ত্যাগ করেন। তিনি অতি দ্রুতি বঙ্গভূমি অতিক্রম করে শ্রীমথুরা ধামের পথ ধরলেন। যাত্রীগণ শ্রী নরোত্তমের প্রতি অতি স্নেহ করতে লাগলেন, তাঁকে দেখে বুঝলেন কোন রাজকুমার হবে। তিনি কখনও দুধ পান করে, কখনও বা ফল মূলাদি ভোজন করে চলতে লাগলেন। শ্রীবৃন্দাবন ভূমি দর্শনের আশায় তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা চলে গেছে। স্থানে স্থানে লোক মুখে শ্রী গৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শুনে তাঁদের শ্রীচরণ চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েন। চলতে চলতে পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব মধুর বৃন্দাবন ॥

এইরূপে চলতে চলতে শ্রী নরোত্তম মথুরা ধামে এলেন এবং যমুনাদেবীকে দর্শন বন্দনাদি করলেন। শ্রীরূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনন্তর শ্রীবৃন্দাবন ধামে এলেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁকে শ্রী লোক নাথ গোস্বামীর শ্রীচরণ সেবা করতে বললেন। অতি বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী শ্রী গৌর-বিরহে অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করছেন। শ্রী নরোত্তম তাঁর চরণ বন্দনা করলে, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বললেন তুমি কে? শ্রী নরোত্তম বললেন আমি আপনার দীন-হীন দাস, শ্রীচরণ সেবাকাঙ্ক্ষী। শ্রী লোকনাথ গোস্বামী বললেন- আমি শ্রী গৌর-গোবিন্দের সেবা করতে পারলাম না অন্যের সেবা কি করে নিব। শ্রী নরোত্তম গুপ্তভাবে নিশাকালে গোস্বামীর মূত্র-পুরীষের স্থানাদি সংস্কার করে রেখে দিতেন। কয়েক বছর এই ভাবে সেবা করতে থাকলে, শ্রী লোকনাথ গোস্বামীর কৃপা হল, শ্রাবণ পৌর্ণমাসীতে দীক্ষা প্রদান করলেন।

তিনি মাধুকরী করে খেতেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে তাঁর চির মিত্রভাব, উভয়ে শ্রী জীবের নিকট অধ্যয়ন করেন। এ সময়

গৌড় দেশ থেকে শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু এলেন; তিনি শ্রী জীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। তিনজন একাশয় ও এক হৃদয় ছিলেন। তিনজন একান্তভাবে ব্রজে ভজন করবেন বলে সঙ্কল্প করলেন কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না। একদিন শ্রী জীব গোস্বামী তিনজনকে ডেকে বললেন ভবিষ্যতে তোমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে হবে। এ গোস্বামী-গ্রন্থরত্ন নিয়ে তোমরা শীঘ্র গৌড় দেশে গমন কর এবং তা প্রচার কর।

তিনজন বৃন্দাবন বাসের সংকল্প ত্যাগ করে শ্রীগুরু-বাণী শিরে ধারণ করলেন। গ্রন্থ রত্ন নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করলেন। বন-বিষ্ণুপুরের রাজা দস্যু দলপতি শ্রী বীর হাম্বীর রাত্রে সেই গ্রন্থ রত্নসমূহ হরণ করলেন। প্রাতে গ্রন্থ-রত্ন না দেখে শিরে যেন বজ্রপাত হল। দুঃখিত অন্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করতে করতে খবর পেলেন রাজা বীর হাম্বীর গ্রন্থ হরণপূর্ব্বক উহা রাজগৃহে সংরক্ষণ করছেন। শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু উৎকল অভিমুখে এবং শ্রী নরোত্তম খেতরির দিকে যাত্রা করলেন ও শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী-গ্রন্থ রাজগৃহ থেকে উদ্ধার করবার মানসে তথায় অবস্থান করতে লাগলেন।

শ্রী নরোত্তম মহাপ্রভুর জন্ম-স্থান দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে এলেন। হা গৌর হরি, হা গৌর হরি বলে গঙ্গা তটে তিনি শত শত বার বন্দনা করতে লাগলেন। একটি বৃক্ষ

তলে উপবেশন করলেন এবং কোথায় প্রভুর জন্ম স্থান? কি করে দর্শন পাবেন ভাবতে লাগলেন, এমন সময় অতিবৃদ্ধ একজন ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করলেন। শ্রী নরোত্তম উঠে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন– বাবা কোথা থেকে এসেছ? কি নাম? শ্রী নরোত্তম নিজ পরিচয় দিয়ে শ্রী গৌরসুন্দরের জন্ম স্থান দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন বললেন।

ব্রাহ্মণ বললেন,— আহা! আজ প্রাণ শীতল হল। গৌরের প্রিয় ভক্তের দর্শন পেলাম।

শ্রী নরোত্তম— বাবা! আপনি শ্রী গৌরসুন্দরের দর্শন পেয়ে ছিলেন?

ব্রাহ্মণ— কি বলব বাবা! শ্রীনিমাই প্রতিদিন এই ঘাটে বসে শিষ্যগনসহ শাস্ত্র চর্চ্চা করতেন। দূর থেকে আমরা তখন তাঁর কি অপূর্ব্ব রূপ দেখতাম, আজও সেই রূপ স্মরণ করে এই বৃক্ষ তলে প্রতিদিন একবার করে আসি। ব্রাহ্মণ বলতে বলতে অশ্রু জলে ভাসতে লাগলেন।

শ্রী নরোত্তম— বাবা! আজ আপনার চরণ দর্শন করে জীবন ধন্য হল! এ বলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রী নরোত্তম ব্রাহ্মণের চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন।

ব্রাহ্মণ—বাবা! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি গোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ কর। গৌর-গোবিন্দের কথা সর্ব্বত্র প্রচার কর।

অতঃপর ব্রাহ্মণ নরোত্তম দাসকে শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। শ্রী নরোত্তম সে পথ দিয়ে শ্রী জগন্নাথ

মিশ্র ভবনে আগমন করলেন। অশ্রুপূর্ন নয়নে তিনি মিশ্র গৃহের দ্বার দেশে সাষ্টাঙ্গ বন্দনাপূর্ব্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনন্তর ভবনে প্রবেশ করে শ্রী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন পেলেন। নরোত্তম তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। অনুমানে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বুঝতে পারলেন ইনি গৌরসুন্দরের কোন কৃপা পাত্র।

শ্রী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কে?

শ্রী নরোত্তম ঠাকুর নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন বর্ত্তমানে শ্রী ব্রজ ধাম, শ্রী জীব গোস্বামী ও শ্রী লোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতির সন্নিকট থেকে এসেছি।

শ্রী শুক্লাম্বর— বাবা তুমি ব্রজে শ্রী লোকনাথ ও শ্রী জীবের থেকে এসেছ? এ বলে উঠে নরোত্তম দাসকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। অনন্তর তিনি যাবতীয় গোস্বামীগণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রী নরোত্তম ব্রহ্মচারীর নিকট ব্রজের যাবতীয় সংবাদ যথাযথ বর্ণনা করলেন। অনন্তর শ্রী নরোত্তম শচীমাতার সেবক— অতিবৃদ্ধ শ্রী ঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দনা করলেন এবং স্বীয় পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রী ঈশান ঠাকুর তাঁর শির স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করতে করতে স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তথায় শ্রী দামোদর পণ্ডিতকেও নরোত্তম বন্দনা করলেন।

অনন্তর শ্রী নরোত্তম শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে এসে শ্রীপতি ও শ্রী নিধি পন্ডিতকে বন্দনা করলেন। তাঁরা স্নেহ ভরে শ্রী নরোত্তমকে

আলিঙ্গন করলেন। কয়েকদিন নবদ্বীপ মায়াপুরে থাকার পর শ্রী নরোত্তম শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে এলেন ও শ্রী অচ্যুতানন্দের চরণ বন্দনা করলেন। পরিচয় পেয়ে শ্রী অচ্যুতানন্দ সাদরে তাঁকে আলিঙ্গন এবং ব্রজের গোস্বামীদিগের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন। শান্তিপুরে নরোত্তম দাস দুই দিবস অবস্থানের পর অম্বিকা কালনায় শ্রী গৌরীদাস পন্ডিতের ভবনে এলেন। তখন শ্রী হৃদয় চৈতন্য প্রভু তথায় অবস্থান করছেন। তিনি গৌরীদাস পন্ডিতের শিষ্য। শ্রী নরোত্তম শ্রী হৃদয় চৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করলেন। সাদরে হৃদয় চৈতন্য প্রভু নরোত্তম দাসকে ধরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবেশন করলেন এবং ব্রজের গোস্বামীগণের সন্দেশ নিতে লাগলেন। এক দিন অম্বিকা কালনাতে শ্রী নরোত্তম ঠাকুর থাকবার পর গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থলী সপ্তগ্রামে এলেন। এ স্থানে শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর থাকতেন। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সপ্তগ্রামবাসীরা পরম ভক্ত হন। শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর সপ্তগ্রাম অন্ধকারময় হয়। শ্রী নরোত্তম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে গমন করলেন। তথায় যে কয়েকজন ভক্ত আছেন প্রভু বিরহে অতি দুঃখে তাঁরা দিন যাপন করছেন। শ্রী নরোত্তম দাস বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করে তথা হতে খড়দহ গ্রামে এলেন।

খড়দহ গ্রামে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতেন। তাঁর শক্তিদ্বয় শ্রী বসুধা ও জাহ্নবা দেবী তথায় অবস্থান করছেন। শ্রী নরোত্তম নিত্যানন্দ ভবনে এসে অঙ্গনে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর নাম

স্মরণ পূর্ব্বক গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রী পরমেশ্বরী দাস ঠাকুর শ্রী নরোত্তম দাসকে অন্তঃপুরে শ্রী বসুধা জাহ্নবা মাতার শ্রীচরণে নিলেন। তাঁরা নরোত্তম দাসের পরিচয় এবং শ্রী জীব ও শ্রী লোকনাথের পরম কৃপা পাত্র শুনে খুব অনুগ্রহ করলেন।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা বসু জাহ্নবা ঈশ্বরী।
অনুগ্রহ কৈল যত কহিতে না পারি ॥

—(ভঃ রঃ ৮।২১২)

চার দিবস শ্রী নরোত্তম দাস খড়দহ গ্রামে কৃষ্ণ-কথা আনন্দে অবস্থান করবার পর শ্রী বসুধা জাহ্নবা মাতা থেকে বিদায় নিয়ে খানাকুল কৃষ্ণনগর শ্রী অভিরাম গোপাল ঠাকুরের আলয়ে এলেন। শ্রী নরোত্তম দাস তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিনি শ্রী গৌর নিত্যানন্দ বিরহে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন। বাহ্য দশা প্রায় সময় থাকে না। শ্রী নরোত্তম তাঁর এরূপ দশা দেখে বহু ক্রন্দন করলেন। অভিরাম ঠাকুরের গোপীনাথ বিগ্রহ অপূর্ব্ব দর্শন। নরোত্তম দাস বিগ্রহ দর্শন করে বহু স্তব-স্তুতি করলেন। এক দিবস অভিরাম গোপাল ভবনে অবস্থানের পর তাঁর অনুমতি নিয়ে নরোত্তম দাস শ্রী নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভু-পরিকরগণের স্মরণ করতে করতে শীঘ্র নীলাচলে এলেন। শ্রী গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রী নরোত্তমের পথ নিরীক্ষণ করছিলেন। এমন সময় শ্রী নরোত্তম উপস্থিত হলেন। নরোত্তম শ্রী গোপীনাথ আচার্য্যের

চরণে দণ্ডবৎ করতেই আচার্য্য তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন— অদ্য তুমি আসবে আমাদের মনে হচ্ছিল। শ্রী নরোত্তম ব্রজবাসী ও গৌড় দেশবাসী ভক্তগণের যাবতীয় সংবাদ প্রদান করলেন।

ভক্তগণ নরোত্তম দাসকে পেয়ে পরম সুখী হলেন, তাঁকে নিয়ে শ্রীমতি জগন্নাথ দেব দর্শনে গেলেন। শ্রী জগন্নাথ শ্রী বলরাম ও শ্রী সুভদ্রা দেবীকে দর্শন করে নরোত্তম বহু স্তব-স্তুতি-দণ্ডবৎ করতে লাগলেন। তারপর শ্রী হরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে এলেন। নরোত্তম প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তথা হতে শ্রী গদাধর পন্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। নরোত্তম হা গৌর প্রাণ গদাধর বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। তথায় শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন পূর্ব্বক শ্রী মামু গোস্বামী ঠাকুরকে বন্দনা করলেন। তিনি তৎকালে গোপীনাথের সেবা করছিলেন।

অনন্তর শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে, গোপীনাথের অঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপে অন্তর্ধান হন তা' ভক্তগণ বর্ণনা করেন।

ন্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন, পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥

—(ভঃ রঃ ৮/৩৫৭)

শ্রী নরোত্তম শ্রবণ মাত্রই হা শচীনন্দন গৌরহরি বলে ভূতলে অচৈতন্য হলেন। ভক্তগণ নরোত্তমের বিরহ আকুলতা দেখে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

অতঃপর শ্রী নরোত্তম কাশী মিশ্র ভবনে শ্রী গোপাল গুরু প্রভুর চরণ দর্শন ও শ্রী রাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শনাদি করলেন। শ্রী গুন্ডিচা মন্দির দর্শনের পথে মহাপ্রভুর লীলাস্থলী জগন্নাথবল্লভ উদ্যান, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি দর্শন করলেন। তিনি কিছুদিন নীলাচলে ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে মহাপ্রভুর বিলাসস্থলী সকল দর্শন করলেন। অতঃপর ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনৃসিংহপুরে এলেন। এ স্থানে শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু অবস্থান করছিলেন। বহুদিন পরে শ্রী নরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করে শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। দুইজন প্রেম ভরে পরস্পরকে কত আলিঙ্গন করলেন।

শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু বহু আদর পূর্ব্বক শ্রী নরোত্তম ঠাকুরকে কয়েক দিন নৃসিংহপুরে রাখলেন। শ্রী নরোত্তমের শুভাগমনে শ্রীনৃসিংহপুরে সংকীর্ত্তন বন্যা প্রবাহিত হল। শ্রী শ্যামানন্দ ও শ্রী নরোত্তম উভয়ে শ্রীকৃষ্ণ কথানন্দে দিন রাত জ্ঞান রহিত হলেন। অনন্তর শ্রী নরোত্তম ঠাকুর শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শীঘ্র শ্রীখন্ডে এলেন। শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন। শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রী নরোত্তম দাসের পিতা শ্রী কৃষ্ণানন্দ দত্তকে ভালভাবে জানতেন। শ্রী নরোত্তম বন্দনা করতেই শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁর শিরে হাত দিয়ে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করলেন। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর ধরে আলিঙ্গন করলেন।

নরোত্তম ঠাকুরকে বসিয়ে পুরী ধামের ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। নরোত্তম ঠাকুরের আগমনে শ্রীখন্ড আনন্দময় হয়ে উঠল। নরোত্তম ঠাকুর কয়েকদিন শ্রীখণ্ডে ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি রঙ্গে সুখে যাপন করলেন।

শ্রী নরোত্তম শ্রীখন্ডবাসী গৌর-পার্ষদগণের থেকে বিদায় নিয়ে কন্টক নগরে শ্রী গদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে এলেন। গৃহাঙ্গনে দন্ডবৎ করতেই শ্রী গদাধর দাস ঠাকুর তাঁকে কোলে তুলে নিলেন।

নরোত্তমে দেখিয়া শ্রীদাস গদাধর।
কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজলে কলেবর ॥
—(ভঃ রঃ ৮/৪৪৮)

শ্রী গদাধর দাস প্রভু শ্রী গৌর-নিত্যানন্দ বিরহে দুঃখে দিন যাপন করছেন। নরোত্তম ঠাকুর দুই দিন তথায় অবস্থান করবার পর রাঢ় দেশে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করতে চললেন। নরোত্তম ঠাকুর একচক্রা গ্রামে এলেন এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করলেন। তথায় একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নরোত্তমকে স্নেহ করে শ্রী নিত্যানন্দের বিবিধ লীলা-স্থলী দর্শন করালেন। হাড়াই পন্ডিত ও শ্রী পদ্মাবতী দেবীর নাম স্মরণ করে নরোত্তম ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রী নরোত্তম ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করার পর খেতরির দিকে যাত্রা করলেন।

খেতরি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে।
অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতী তীরে ॥
পদ্মাবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে।
আইলা গ্রামবাসীলোক আগুসরি নিতে ॥

—(ভঃ রঃ ৮/৪৬৮)

বহুদিন পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতরি গ্রামে শুভবিজয় করছেন শুনে আনন্দে খেতরিবাসিগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এলেন।

রাজা শ্রী কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও শ্রী পুরুষোত্তম দত্ত পরলোকে গমন করার পর পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র শ্রী সন্তোষ দত্ত বিষয় সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। তিনি সজ্জনাগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। বহুদিন পরে শ্রী নরোত্তম শুভাগমন করছেন শুনে আনন্দে তাঁকে বহু সম্মান পুরঃসর অভিনন্দন করে আনবার জন্য লোকজন সঙ্গে খেতরি গ্রামের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর দূর থেকে শ্রী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করে দন্ডবৎ হয়ে পড়লেন এবং অগ্রসর হয়ে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে চরণ-ধূলি গ্রহণ করলেন। শ্রী নরোত্তম সন্তোষ দত্তকে স্নেহ ভরে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন।

অতঃপর কয়েক দিবস পর শ্রী সন্তোষ দত্ত শ্রী নরোত্তম ঠাকুর থেকে শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত মন্দির নির্মাণ পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানালেন। শ্রী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সানন্দে অনুমতি প্রদান করলেন।

রাজা সন্তোষ দত্ত কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল মন্দির ভোগশালা, কীর্ত্তন মন্ডপ ভক্তগণের নিবাস-গৃহ 'সরোবর' পুষ্পোদ্যান ও অতিথিশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলেন। ফাল্গুন পৌর্ণমাসী শ্রী গৌরসুন্দরের জন্মোৎসব বাসরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহা মহোৎসবের, রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায়, বিপুল আয়োজন আরম্ভ করলেন। দেশ-বিদেশে রাজা, জমিদার, কবি, পন্ডিত, বৈষ্ণব ও সাহিত্যিক প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করবার জন্য আমন্ত্রণপত্র সহ লোক প্রেরণ করলেন। কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তিকে পুরী, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, কালনা প্রভৃতি স্থানের গৌরপার্ষদগণকে আমন্ত্রণ করতে শ্রী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পত্র সহ প্রেরণ করলেন। দেশ বিদেশে উত্তম উত্তম গায়ক ও বাদকগণকে আমন্ত্রণের জন্য কিছু লোক প্রেরণ করলেন। এককালে ছয়টি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবার উদ্যোগ চলতে লাগল।

খেতরি মহোৎসব

বুধরিগ্রামে শ্রী গোবিন্দ কবিরাজের গৃহের মহোৎসব সেরে ভক্তগণসহ শ্রীনিবাস আচার্য্য খেতরির মহোৎসবের অধিবাসের দুই দিবস পূর্ব্বে খেতরিতে শুভাগমন করলেন। অধিবাসের এক দিবস পূর্ব্বে উড়িষ্যার নৃসিংহপুর হতে শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু, খড়দহ থেকে শ্রী জাহ্নবা মাতার সঙ্গে শ্রী পরমেশ্বরী দাস, কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আর্চায্য, রঘুপতি বৈদ্য, মীনকেতন রামদাস, মুরারি চৈতন্য দাস, জ্ঞানদাস, মহীধর, শ্রী শঙ্কর,

কমলাকর পিপ্পলাই, গৌরাঙ্গ দাস, নকড়ি, কৃষ্ণ দাস, দামোদর, বলরাম দাস, শ্রী মুকুন্দ ও শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এলেন। শ্রীখণ্ড থেকে রঘুনন্দন ও অন্যান্য ভক্তগণ, নবদ্বীপ থেকে শ্রীপতি, শ্রী নিধি প্রভৃতি, শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রী অচ্যুতানন্দ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীগোপাল প্রভৃতি; অম্বিকা কালনা হতে শ্রী হৃদয়চৈতন্য প্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ খেতরি গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত পদ্মবতী নদী পারের জন্য বৃহৎ বৃহৎ নৌকা এবং পদ্মাবতী তট হতে খেতরি পর্যন্ত পাল্কী ও গো যান প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রী নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রাজা সন্তোষ দত্ত বৈষ্ণবগণের অভিগমন পূর্ব্বক সাদরে বহু সম্মান পুরঃসর পুষ্প মাল্যাদি দিয়ে অভিনন্দন পূর্ব্বক আনয়ন করেন। বৈষ্ণবগণের থাকবার জন্য পৃথক গৃহ ও ভৃত্য প্রস্তুত ছিল। ভুবনপাবন বৈষ্ণবগণের পদধূলিতে খেতরি গ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হল। শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন কোলাহলে গগন পবন পূর্ণ হল।

শ্রীভগবদ্ মন্দির ও অন্যান্য গৃহের দ্বারে দ্বারে কদলী স্তম্ভ, মঙ্গলঘট, পাত্রমধ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্য সমূহ, পত্র পুষ্পের বৃহৎ তোরণ সকল দ্বারে দ্বারে ও সর্ব্বত্র স্বস্তিক চিহ্ন দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা পাচ্ছিল। উৎসব মন্ডপের কোন স্থানে পর্ব্বত প্রমাণ মৃৎ ভাণ্ড সকল, কোন স্থানে রজত পাত্র সকল, কোন স্থানে দুধের বৃহৎ বৃহৎ গাগরী, কোন স্থানে ঘৃতের গাগরী, কোন স্থানে সহস্র সহস্র ভান্ড দধি, কোন স্থানে উৎসবের তরি-তরকারি পর্বত প্রমাণে শোভা পাচ্ছিল।

অধিবাস দিবসে বৈষ্ণবগণ শ্রীমতি জাহ্নবা মাতার আদেশ নিয়ে শ্রীশ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহা-মহোৎসবের অধিবাস কার্য্য করতে লাগলেন। সন্ধ্যাকালে অধিবাস সংকীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রী নরোত্তম ঠাকুর প্রথমে চন্দন মাল্যাদি দ্বারা শ্রীমতি জাহ্নবা মাতার পূজা করলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণকে মালা চন্দনে ভূষিত করলেন। শ্রী নরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুরোধে শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গলাচরণ গীত আরম্ভ করলেন। মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত মঙ্গল অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি হবার পর বৈষ্ণবগণ বিশ্রাম করলেন।

বহু সহস্র ব্যক্তি অধিবাস মহোৎসবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্রী শ্রী গৌর-আবির্ভাব মহামহোৎসবের ও শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট মহামহোৎসবের প্রাতঃকাল হতে বৈষ্ণবগণ মহা-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেক কার্য্যাদি করতে লাগলেন। পূর্বাহ্নে অভিষেক মুহূর্ত্তে শ্রীনিবাস আচার্য্য ছয় বিগ্রহ সাথে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলেন। তখন দেশ-বিদেশ থেকে আগত বাদ্যকারগণ বিবিধ যন্ত্র বাদন, গায়কগণ মধুর সংগীত ও নর্ত্তকগণ মধুর নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। অপর দিকে বৈষ্ণবগণের মধুর নাম সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক আনন্দময় হচ্ছিল।

যথাবিধানে অভিষেক কার্য্য শ্রী আচার্য্য সমাপ্ত করবার পর বিগ্রহগণকে অপূর্ব বস্ত্র অলংকারে বিভূষিত করলেন। অতঃপর

বিবিধ মিষ্টান্ন তরি-তরকারী পিঠা পানা প্রভৃতি সহস্র প্রকার বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীরাধাকান্ত এই ছয় বিগ্রহের পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ভোগ নিবেদন করলেন। ভোগ অর্পণ কীর্ত্তন হবার পর আচমন দিয়ে তাম্বুল বাটীকা অর্পণ করলেন; অনন্তর গন্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা বিগ্রহগণকে ভূষিত করে, মহা আরত্রিক করলেন। আরত্রিক সংকীর্ত্তনাদি বৈষ্ণবগণ মহানন্দ ভরে করতে লাগলেন। কীর্ত্তন নৃত্যাদির পর সকলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলেন।

তারপর শ্রীনিবাস আচার্য্য ভগবদ্ প্রসাদী চন্দন মালা শ্রীমতি জাহ্নবা মাতাকে অর্পণ করলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণকে প্রদান করলেন। শ্রীনিবাস, শ্রী নরোত্তম ও শ্রী শ্যামানন্দ সকলকে প্রসাদী চন্দন মালা দেওয়া শেষ হলে, জাহ্নবা মাতার আদেশে শ্রী নৃসিংহ চৈতন্য দাস তিনজনকে প্রসাদী চন্দন মালা পরিয়ে দিলেন। বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন মণ্ডপে যথাযথ আসন গ্রহণ করলেন। শ্রীমতি জাহ্নবা মাতা কীর্ত্তন মন্ডপের সম্মুখে উত্তম আসনে উপবিষ্ট হলেন। অনন্তর শ্রীমতি জাহ্নবা মাতার ও শ্রী অচ্যুতানন্দের আদেশে শ্রী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রী গৌরাঙ্গ দাস, শ্রীগোকুল দাস ও শ্রী বল্লভ দাস প্রভৃতি তাঁর দোঁহারী করতে লাগলেন, দেবীদাস মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। পূর্বোক্ত শ্রী গৌরাঙ্গ দাসাদি নিবন্ধ, অনিবদ্ধ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ও মুর্চ্ছণাদিতে পটু ছিলেন।

শ্রী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সেই সুমধুর কীর্ত্তন ধ্বনি ও স্বর-মূর্চ্ছণাতিতে চতুর্দ্দিকস্ত অগণিত নরনারী প্রেমাশ্রু বর্ষণ

করতে লাগলেন। সকলে বৈকুণ্ঠানন্দ সুখসিন্ধুতে বিহার করতে লাগলেন, অধিক কথা কি স্বয়ং শ্রী গৌরসুন্দর সপার্ষদ সেই সংকীর্ত্তনে উদিত হলেন।

কহিতে কি সংকীর্ত্তন সুখের ঘটায়।
গণ সহ অবতীর্ণ হইলা গৌররায় ॥
মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে।
সংকীর্ত্তন মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে ॥

-(ভঃ রঃ ১০/৫৭২)

মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রী নরহরি, শ্রী মুকুন্দ, শ্রী গৌরীদাস পন্ডিত, শ্রী অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী মাধব ঘোষ, শ্রী বাসুঘোষ, শ্রী গোবিন্দ ঘোষ, আচার্য্য পুরন্দর, শ্রী মহেশ, শ্রী শংকর, শ্রীধর, শ্রী জগদীশ পন্ডিত, শ্রী যদুনন্দন ও শ্রী কাশীশ্বর প্রভৃতি প্রভু পার্ষদগণ প্রকটিত হয়ে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে শ্রী অচ্যুতানন্দ, শ্রী রঘুনন্দন, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি প্রভৃতি মিলিত ভাবে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন।

কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কিবা ভক্ত মণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র ॥
প্রকাশিল প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা।
কিবা এ বিলাস ইহা বুঝে কোন জনা ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ।
দুঁহে অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ ॥

-(ভঃ রঃ ১০/৬০৭)

ভক্তবৎসল শ্রী গৌরহরি নিজগণ সহ অবতীর্ণ হয়ে শ্রীনিবাস ও শ্রী নরোত্তমের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। সংকীর্ত্তন অন্তে শ্রীমতি জাহ্নবা মাতা শ্রীবিগ্রহগণকে ফাগু অর্পণ করে বৈষ্ণবদের ফাগু খেলতে আদেশ করলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দ ভরে ফাগু খেলতে লাগলেন।

কিবা পরস্পর ফাগু খেলায় বিহ্বল।
কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল ॥
-(ভঃ রঃ ১০/৬৫১)

এভাবে ফাগু খেলায় অপরাহ্ন কাল সমাপ্ত হ'লে বৈষ্ণবগণ সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক গীত আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যা কালে স্নানাদি করে শ্রীনিবাস আচার্য্য অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন।

তথাহি অভিষেক গীত—

ফাল্গুন পূর্ণিমা মঙ্গলের সীমা
প্রকট গোকুল ইন্দু।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
উথলে আনন্দ সিন্ধু ॥
কিবা কৌতুক পরস্পরে।
শচীদেবী ভালে পুত্র লৈয়া কোলে
বিলাসে সূতিকা ঘরে ॥
বালক দেখিতে ধায় চারিভিতে
কেহ না ধরয়ে ধৃতি।

গ্রহণান্ধকারে কে চিনে কাহারে
অসংখ্য লোকের গতি ॥
বালক মাধুরী দেখি আঁখি ভরি
পাসরে আপন দেহ।
নরহরি কয় শচীর তনয়
প্রকাশে কি নবনেহা ॥

অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত রাত কিভাবে কেটে গেল কেহ জানতে পারলেন না। অতঃপর মঙ্গল আরতি আরম্ভ হল। মঙ্গল আরতির নৃত্যগীত সমাপ্ত হলে বৈষ্ণবগণ দন্ডবৎ করে নিজ নিজ কুটিরে গমন করলেন এবং প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করতে লাগলেন। এ দিকে শ্রীমতি জাহ্নবা মাতা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগ রন্ধনের জন্য রন্ধন শালায় প্রবেশ করলেন। রন্ধন বিদ্যানিপুণা শ্রীমতি জাহ্নবা মাতা অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রকার ব্যঞ্জন তরকারী মিষ্টান্ন পিঠা পানাদি তৈরি করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের স্নান অভিষেক পূজাদি সেরে ভোগ লাগালেন।

অতঃপর ভোগ আরত্রিক অন্তে মহান্তগণ মহাপ্রসাদ ভোজন করতে বসলেন। স্বয়ং জাহ্নবা মাতা পরিবেশন করলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি সহ ভাগবতগণ প্রসাদ সেবা করতে রাগলেন। মহান্তগণের প্রসাদ পাওয়া শেষ হ'লে শ্রীমতি জাহ্নবা মাতার অনুরোধে শ্রী নরোত্তম, শ্রী নিবাস ও শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু প্রসাদ পেলেন। সর্ব্ব-শেষে শ্রীমতি জাহ্নবা মাতা প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

বাহিরের মন্ডপে উৎসবে আগত সহস্র সহস্র লোককে রাজা সন্তোষ দত্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধব অতিথি ব্রাহ্মণাদির প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হলে রাজা গৃহ পরিজনের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় দিবসে রাজা সন্তোষ দত্তের একান্ত অনুরোধে ভাগবতগণ নিজ নিজ কুটীরে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন পূর্ব্বক ভগবানকে অপর্ণ করতঃ প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

তৃতীয় দিবসে বৈষ্ণবগণ যথাস্থানে বিজয় করতে উদ্যোগ করলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভাগবতগণকে মুদ্রা, বস্ত্র ও বিবিধ প্রকার জল পাত্রাদি অর্পণ করতঃ ভাগবতগণকে বন্দনা করলেন। ভাগবতগণ রাজাকে বহু আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন। শ্রীমতি জাহ্নবা মাতা নিজ পরিকরসহ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। খেতরিতে কয়েকদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু অবস্থান করবার পর তাঁরাও যথাস্থানে বিদায় হলেন।

খেতরির এ মহোৎসবের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যশ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ আচার্য্য ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্বান্ মণ্ডলী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।

গোপালপুর গ্রামে শ্রী বিপ্রদাস নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অকস্মাৎ তাঁর গৃহে একদিন শ্রী নরোত্তম ঠাকুর শুভ বিজয় করলেন। বিপ্রদাস বড়ই সুখী হলেন, যথাবিধি আসনাদি

দিলেন। বিপ্রদাসের ধানের গোলায় এক ভয়ঙ্কর সর্প বাস করছিল, তার ভয়ে কেহ গোলার ধারে যেতে পারত না। এই কথা বিপ্রদাস শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় ঈষৎ হাস্য করলেন, বললেন কোন চিন্তা কর না। ঠাকুর মহাশয় গোলার দরজা খুলতেই সর্প অন্তর্ধান হল।

গোলা হৈতে প্রিয়া সহ শ্রী গৌরসুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্ব্ব নয়ন গোচর ॥

—(ভঃ রঃ ১০/২০২)

সকলে দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হল যে গোলা খুলতেই গোলার ভিতর থেকে শ্রী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বেরিয়ে শ্রী ঠাকুর মহাশয়ের কোলে উঠলেন। সে শ্রী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ নিয়ে ঠাকুর মহাশয় খেতরিতে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। বর্ত্তমানে বিগ্রহ গাম্ভীলাতে আছেন।

শ্রী ঠাকুরের যশ মহিমা

কোন সময় এক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক নিজ ছাত্রদের কাছে শ্রী ঠাকুর মহাশয়কে শুদ্র বুদ্ধি করে তাঁর অনেক নিন্দা করেন। সেই অপরাধে ব্রাহ্মণের সর্ব্বঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়। রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ডুবে মরবেন সঙ্কল্প করলেন। সে রাত্রে ভগবতী দেবী ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বললেন- "তুই পরম ভাগবত শ্রী নরোত্তমকে শূদ্র বুদ্ধি করেছিস্ তোর কোটি জন্মেও নিস্তার নাই, তুই যদি তাঁর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিস্ তো তোর ভাল হবে।"

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ গলবস্ত্র হয়ে দীন ভাবে ক্রন্দন করতে করতে শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুষ্ঠ রোগ সেরে গেল। শ্রী ঠাকুর মহাশয় তাঁকে কৃষ্ণ-ভজন করতে উপদেশ দিলেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্ত হলেন।

একদি শ্রী নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ পদ্মাবতী নদীতে স্নান করতে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন– দুই ব্রাহ্মণ কুমার অনেক ছাগ মেষ নিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর মহাশয় বললেন এ দুই ব্রাহ্মণ কুমার যদি হরি ভজন করত তাদের রূপ যৌবনাদি সার্থক হত। ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় এ কথা শুনতে পেল। তারা শ্রী ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজের দিব্য মূর্তি ও মধুর বাক্য শুনে তাঁদের পাশে এল এবং বিনীত ভাবে বন্দনা করল। ঠাকুর মহাশয় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল আমরা গোয়াস গ্রামের জমিদার শ্রী শিবানন্দ আচার্য্যের পুত্র। আমাদের নাম হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। গৃহে দুর্গাপূজা হচ্ছে, পিতার আদেশে বলি দেওয়ার জন্য এসব ছাগ মেষ নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা আমাদের কিছু উপদেশ প্রদান করুন। আপনাদের দেখে বড় শান্তি পাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ পুত্রদ্বয়ের দৈন্যভাব দেখে শ্রী ঠাকুর মহাশয় মধুর হাস্য পূর্ব্বক ভগবদ্ তত্ত্ব কথা বলতে লাগলেন। বেদোক্ত যে কর্মকান্ড তাহা রাজস ও তামস ভাবযুক্ত, পরিণামে নরকপ্রদ। বেদোক্ত কর্মকারী কর্মিগণ পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গ হতে চ্যুত হয় এবং নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষয় দ্বারা আচ্ছন্নমতি বিষয়ী বেদের আপাততঃ মধুর বাক্য বহুমানন পূর্ব্বক জীব-হত্যাদি করে ও

অন্তে নরক যন্ত্রণা পেয়ে থাকে। সমস্ত জীব ভগবদ্ শক্তি। পরমাত্মদর্শী, হিংসা শূন্য, নিরহঙ্কার ভগবদ্ ভজনকারীগণ বাস্তবতঃ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ পাদপদ্ম লাভ করতে পারে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় উঠে ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে বললেন, অধম ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়কে চরণরজঃ দিয়ে কৃপা করুন। ঠাকুর মহাশয় তাদের শিরে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন–"তোমাদের কৃষ্ণ-ভক্তি হউক।"

ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় ছাগ ও মেষগুলিকে ছেড়ে দিয়ে শ্রী ঠাকুর মহাশয় ও শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে পদ্মাবতী নদীতে স্নান করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের এলেন। সে দিবস প্রসাদ পাওয়ার পর পুনঃ তারা ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজের নিকট থেকে বিবিধ তত্ত্ব-কথা শ্রবণাদি করলেন। দ্বিতীয় দিবসে মস্তক মুণ্ডন পূর্বক শ্রী হরিরাম শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ থেকে এবং রামকৃষ্ণ শ্রী ঠাকুর মহাশয়ের থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

এদিকে তাদের পিতা শিবানন্দ আচার্য্য খোঁজ করতে করতে দেখলেন পুত্রদ্বয় খেতরিতে শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তথায় বাস করছে। শিবানন্দ আচার্য্যের ক্রোধের সীমা রইল না।

কিছুদিন পরে দুই ভাই গৃহে ফিরে এলেন। তাঁদের ললাটে উর্দ্ধপুন্ড্র, কণ্ঠে তুলসী মালা, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ও শিরে শিখা

দেখে শিবানন্দ আচার্য্য অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন—

ওরে মুর্খ কহ দেখি কোন্ শাস্ত্রে কয়।
ব্রাহ্মণ হৈতে কি বৈষ্ণব বড় হয়?
ভগবতী নিগ্রহ করিলা এতদিনে!
বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে ॥
বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব।
পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব ॥

—(শ্রী নরোত্তম বিলাস ১০/৪৩-৪৪)

পিতার এই সমস্ত কথা শুনে কুমারদ্বয় বলতে লাগলেন– ধর্মে কিংবা কর্মে অন্যের হিংসা হয়- দুঃখ হয় তা ধর্ম কিংবা কর্ম বলে অভিহিত হতে পারে না। তার নাম অকর্ম কিংবা অধর্ম। ওহে পিতঃ শ্রী শালগ্রাম নারায়ণ ছাড়া কোন দেব-দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে পারে কি? সেই শ্রী নারায়ণ ভজন বাদ দিয়ে কেবল দেব-দেবীর পূজা নিরর্থক মনে করি।

শিবানন্দ আচার্য্য ও স্মার্ত্ত পন্ডিতগণ পুত্রদ্বয়ের কাছে সিদ্ধান্তে পরাভূত হলেন। মনে মনে শিবানন্দ আচার্য্য বিচার করলেন, একটা বড় স্মার্ত্ত পন্ডিত এনে এদের পরাভূত করব এবং বৈষ্ণব ধর্ম ছোট বলে প্রতিপাদন করব। মিথিলা থেকে স্মার্ত্ত মহাপন্ডিত মুরারিকে শিবানন্দ আচার্য্য নিয়ে এলেন এবং এক তর্ক সভার আয়োজন করে পুত্রদ্বয়কে তথায় ডাকলেন এবং বললেন তোমরা কি সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণব বড় বলছ তা এ সভার মধ্যে বল।

শ্রী হরিরাম ও শ্রী রামকৃষ্ণ দুইজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ পূর্ব্বক ভাগবত সিদ্ধান্ত দ্বারা স্মার্ত্ত মত খন্ড বিখন্ড করতে লাগলেন। স্মার্ত্ত মহাপণ্ডিত মুরারি তাঁদের সামনে কোন যুক্তি উত্থাপন করতে পারলেন না। পরিশেষে তিনি অধোবদনে সভা ত্যাগ করলেন ও লজ্জায় ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করলেন।

শিবানন্দ আচার্য্য পরাভূত হয়ে রাত্রে দেবীর চিন্তা করতে লাগলেন। নিদ্রিত হ'লে দেবী স্বপ্নে বলতে লাগলেন— "ওহে শিবানন্দ ! সকলের পতি, গতি ও প্রভু হলেন শ্রীহরি। তাঁকে অবজ্ঞা করে যারা আমাকে ভজন করে আমি তাদের বিনাশ করে থাকি। যারা শ্রীহরিকে মানে না তারা দৈত্য। যারা শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত, তাঁরাই বাস্তব আমার প্রিয়। তুই যদি রক্ষা পেতে চাস্ তবে নরোত্তমের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নতুবা বৈষ্ণব অপরাধী তোকে আমি বিনাশ করব।" দেবী শিবানন্দ আচার্য্যকে এইরূপ বাক্যে শাসন করে অন্তর্হিতা হলেন।

গাম্ভীলা গ্রামে শ্রী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীমুখে গোস্বামী সিদ্ধান্ত শুনে একান্তভাবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

শ্রী জগন্নাথ আর্চায্য নামক এক ব্রাহ্মণ একান্ত দেবীর উপাসনা করতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখছেন দেবী তাঁকে বলেছেন– "ওহে সরল বিপ্র! তুমি শ্রী নরোত্তমের নিকট যাও ও

তাঁর আশ্রয় করে কৃষ্ণ ভজন কর। তোমার পরম কল্যাণ হবে। কৃষ্ণই আমাদের প্রভু, পতি ও গুরু। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমরা কেহ স্বতন্ত্র হয়ে চলতে পারি না।"

জগন্নাথ আচার্য্য প্রাতঃকালে স্নানাদি সেরে খেতরি গ্রামে এলেন এবং শ্রী নরোত্তম ঠাকুরকে দন্ডবৎ করে সমস্ত কথা বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় হাস্য করে বললেন আপনার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ আছে। শুভদিনে ঠাকুর মহাশয় তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। শ্রী জগন্নাথ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের স্নিগ্ধ শিষ্য হলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা দেখে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগল। সকলে রাজা নরসিংহের কাছে গিয়ে নালিশ করল– মহারাজ! আপনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজকে না বাঁচান, তবে তারা ধ্বংস হবে। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করছে এবং যাদু করে সকলকে মুগ্ধ করছে।

রাজা নরসিংহ বললেন— আমি আপনাদের রক্ষা করব। আমায় কি করতে হবে বলুন। ব্রাহ্মণগণ বললেন মহাদিগ্বিজয়ী পন্ডিত শ্রী রূপনারায়ণকে সংগে নিয়ে আমরা খেতরি যাব এবং নরোত্তমকে পরাভূত করব। সে আমাদের সামনে কিছু বলতে পারবে না। এতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

রাজা নরসিংহ বললেন আমি স্বয়ং আপনাদের সঙ্গে যাব। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে খেতরি গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করলেন। একজন লোক এসে খেতরিতে

শ্রীল নরোত্তম ও শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ-আদির নিকট জানালেন।

শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী এসব শুনে বড় দুঃখিত হলেন। তখন দুইজন অনুসন্ধান করে জানলেন স্মার্ত্ত পন্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে একদিন বিশ্রাম করে খেতরিতে আসবেন। তাঁরা শীঘ্রই কুমারপুরের বাজারে এলেন এবং দুইজন দুইখানি দোকান খুললেন। শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ কুম্ভকারের দোকান ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী পান সুপারির দোকান।

এদিকে রাজা নরসিংহ সংগে স্মার্ত্ত পন্ডিতগণ কুমারপুর বাজারে এলেন এবং বাজারের বৃহৎ দোকান গৃহাদিতে অবস্থান করতে লাগলেন। স্মার্ত্ত পন্ডিতগণের ছাত্রগণ কুম্ভকারের দোকানে এল হাঁড়ি কিনতে। কুম্ভকার (রামচন্দ্র কবিরাজ) সংস্কৃত ভাষার কথা বলতে লাগলেন। ছাত্রগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগল, ক্রমে তর্ক-বির্তক আরম্ভ হল।

এদিকে পান সুপারির দোকানদারের (গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে ছাত্রদেরও তর্ক-বির্তক আরম্ভ হল। ক্রমে অধ্যাপকগণ তর্ক বিতর্ক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে কথা আরম্ভ হল। অধ্যাপকগণও তাঁদের কথার জবাব দিতে পারছেন না। পরিশেষে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ পন্ডিত সেখানে এলেন। কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে পন্ডিত রূপনারায়ণ তথায় পরাস্ত হলেন। চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল হতে লাগন। বাজারের কুম্ভকার তাম্বুলিকের সহিত স্মার্ত্ত পন্ডিতগণ পরাভূত হলেন। তখন রাজা নরসিংহ অনুসন্ধান নিলেন এই

কুম্ভকার ও তাম্বুলিক শ্রীল নরোত্তম দাসের শিষ্য। তিনি পন্ডিতগণকে বললেন আপনারা যখন তাঁর এই সামান্য শিষ্যগণের সঙ্গে সিদ্ধান্ত বিচারে পারেন না, তখন তাঁর সঙ্গে কিরূপে বিচার করবেন? স্মার্ত্ত পন্ডিতগণ নীরবে তথা হতে স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন।

রাত্রিকালে রাজা নরসিংহ ও শ্রী রূপনারায়ণ স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং দুর্গাদেবী বলছেন- "যদি শ্রী নরোত্তমের চরণে শরণ না নিস্ এ খড়্গ দ্বারা সকলকে বিনাশ করব।" প্রাতঃকালে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের সন্নিধানে এলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁদের বহু আদর সৎকার পূর্ব্বক বসালেন এবং দৈন্য করে বললেন আপনাদের ন্যায় সজ্জন পন্ডিতের দর্শনে আমি ধন্য হলাম। রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুরের বৈষ্ণবীয় নম্র ব্যবহারে একেবারেই মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর চরণে সাষ্টঙ্গ দন্ডবৎ করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। পরিশেষে দেবীর কথা জ্ঞাপন করলেন। শ্রী নরোত্তম ঠাকুর শুনে মৃদুহাস্য করলেন। অনন্তর কিছুদিন বাদ তাঁদের রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করলেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্দ্ধান

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিরন্তর গৌর নিত্যানন্দের গুণ গানে বিভোর থাকতেন। দিনের পর দিন কত পাষন্ড তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে পবিত্র হতে লাগলেন। শ্রী রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গেলেন। কয়েকমাস

বাদ তথায় তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। বোধ হয় এই নিদারুণ সংবাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রাপ্ত হলে, ভক্ত বিরহ সইতে অক্ষম হয়ে তিনিও কয়েক দিন বাদে নিত্যলীলায় প্রবশে করলেন। এ সব নিদারুণ সংবাদ পেয়ে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বিরহ সিন্ধুতে যেন নিমজ্জিত হলেন। কাতর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন–"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥" এ নিদারুণ বিরহ সিন্ধুতে ভাসতে ভাসতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ভক্তগণ সংগে গঙ্গাতটে গাম্ভীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন। ভক্তগণকে ঠাকুর মহাশয় নাম-সংকীর্ত্তন করতে আদেশ করলেন। ভক্তগণ নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন সহ ঠাকুর মহাশয় গঙ্গাতীরে এলেন এবং সজল নয়নে গঙ্গা দর্শন করতে করতে দন্ডবৎ করলেন। অনন্তর স্নান করলেন। গঙ্গা তীরে স্বল্পজলে উপবেশন করলেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন, শ্রী রামকৃষ্ণ আচার্য্য ও শ্রী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী দুই দিকে কীর্ত্তন করছেন। ইতিমধ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় দুই জনকে বললেন শ্রীগঙ্গাজলে আমার অঙ্গ মার্জ্জন কর। এই বলে তিনি নামসংকীর্ত্তনে মগ্ন হলেন। কীর্ত্তন করতে করতে তাঁরা গঙ্গাজল নিয়ে যখন অঙ্গ মার্জ্জন করতে উদ্যত হলেন তৎক্ষণাৎ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে করতে শ্রীগঙ্গার সহিত মিলিত হয়ে গেলেন।

কার্ত্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমীতে তিনি অপ্রকট লীলা করলেন।

–ঃঃ ০ ঃঃ–

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

(শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ)

জয় সনাতনরূপ, প্রেমভক্তি রসকূপ,
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।
দুঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকটিল কল্পতরু জনু ॥
প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল মধুর রসাশ্রয়॥
যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবান জিনি হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যাঁরা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে সেই ধন,
সে রতন মোর গেল হারা ॥
ভাগবত শাস্ত্র মর্ম, নববিধ ভক্তিধর্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই
এই ভক্তি পরম কারণ॥
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।
কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥
আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ স্মৃতি মাঝে।

অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল,
গাই যেন সতের সমাজে॥
অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি করোঁ বস্তু জ্ঞান,
অন্য সেবা অন্য দেবপূজা।
হাহা কৃষ্ণ বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,
মনে আর নহে যেন দুজা॥
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পিরীতি রস সুখে।
যুগল ভজয়ে যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা,
এই কথা রহু মোর বুকে॥
যুগল চরণ সেবা এই ধন মোরে দিবা,
যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগল কিশোররূপ, কামরতি গুণভূপ,
মনে রহু ও লীলা পিরীতি॥
দশনেতে তৃণ ধরি, হাহা কিশোর কিশোরী,
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজসুত শ্যাম, বৃষভানুসুতা নাম
শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী॥
কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তায়,
কন্দর্প দরপ করু চূর।
নটবর শিরোমণি, নটিণীর শিখরিণী,
দুঁহু গুণে দুঁহু মনঝুর॥
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেমনীল কান্তি ধর,
ভাব ভূষণ করু শোভা।

নীল পতীবাসধর, গৌরী শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুহেঁ শোভা॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তছু পায় নরোত্তম কহে।
দিবানিশি গুণ গাও, পরম আনন্দ পাও,
মনে এই অভিলাষ হয়ে॥
জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেম ভকতি মহারাজ।

শ্রীল গোবিন্দ দাস রচিত শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের মহিমা

যা কর মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ॥
প্রেম মুকুটমণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গাহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতরি মাহ বৈঠত,
সঙ্গাহি ভকত সমাজ॥
সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজ্জ্বলরস,
পরমানন্দ সুখসার ॥
শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয়ে রসে উনমত,
ধর্মাধর্ম নাহি জান।
যোগ দান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন,
তাকে গৌরব করু আপ।

সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ॥
অভকত চোর, দুরাহি ভাগি রহুঁ,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

= ০ =

পদ্মবতীর মাহাত্ম্য

পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা দেবী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য কারো অজানা নয়। আমরা সকলেই গঙ্গা নদীতে স্নান করি, গঙ্গা জল মস্তকে ধারণ করি, পূজা-পার্বণে গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করে উপকরণ পবিত্র করার উদ্দেশ্যে গঙ্গা জল অর্পণ করি। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য অপরিসীম। যদিও গঙ্গাদেবীর এহেন অপূর্ব মাহাত্ম্য আমরা দেখতে পাই, কিন্তু পদ্মাবতী নদী যদিও সেই একই গঙ্গা ধারা তবুও কেন মানুষ সেই পদ্মায় তর্পন ক্রিয়া, পিণ্ডদান, স্নানাদিও গঙ্গার মতো পবিত্র মনে করে না? এর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাই বা কি?

কার অভিশাপের ফলে পদ্মাবতী উপেক্ষিত?

কি সেই অভিশাপ?

কিভাবে তার শাপমোচন হয়?

এমনকি বর্তমান সময়ে মহাপ্রভুর কৃপায় কিভাবে গঙ্গার থেকেও পদ্মা আরোও অধিক মহিমান্বিত? শাস্ত্রের আলোকে আমরা সেই ইতিহাস জানার চেষ্টা করবো।

পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণনা রয়েছে— পুরা কালে সগর বংশ উদ্ধারার্থে সগর বংশের একমাত্র উত্তাধিকারী ভগীরথ যখন চিন্ময় জগৎ থেকে মা গঙ্গাকে আহ্বান করে এই ধারধামে নিয়ে আসছিলেন, তখন ভগীরথ শঙ্খবাদ্য সহকারে অগ্রভাগে গমন করছিলেন আর শঙ্খবাদ্য অনুসরণ করে মা গঙ্গাদেবী তাঁর পিছু পিছু ধাবিত হচ্ছিলেন। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ফারাক্কা বাঁধের অদূরে ভগীরথকে অনুসরণ করার পর হঠাৎ মা গঙ্গা পূর্বদিক ধাবিত হচ্ছিলেন। ভগীরথ যখন পিছন ফিরে দেখলেন মা গঙ্গাদেবী আর তাকে অনুসরণ করছেন না তখন তিনি মা গঙ্গাদেবীর উপর রুষ্ট হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

আসলে গঙ্গাদেবীর হঠাৎ করে মোড় পরিবর্তন করার কারণটি ছিল এই যে, অদূরেই ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হচ্ছিল। সে জন্য মা গঙ্গাদেবী ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সেই দিকে আকর্ষণ অনুভব করছিলেন। যেহেতু ভগীরথ সগর বংশ উদ্ধারার্থে এই ধরাধামে গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করে নিয়ে আসছিলেন, তাই মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য ভগীরথ তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যে স্থান থেকে গঙ্গাদেবী পূর্বদিকে ধাবিত হচ্ছিলেন, সেই স্থান হতে তার নাম হবে পদ্মাবতী এবং সেই পদ্মাবতীতে কেউ স্নান করবে না। কোনো পাপীও তার পাপ মোচনার্থে সেই পদ্মাবতীতে স্নান

করলে তার পাপমোচন হবে না। এইভাবে আমরা দেখতে পাই, সত্যিকার অর্থেই হাজার হাজার মাইল দূর থেকে মানুষ পাপ মোচনার্থে গঙ্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করে কিন্তু পদ্মাবতীতে কেউ স্নান করে না। এমনকি পদ্মার তীরের লোকজনও গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে না। এই যে, মা গঙ্গাদেবী অভিশপ্ত হয়ে পদ্মবতী নাম ধারণ করেছেন আজও কি তিনি অভিশপ্ত? তিনি কি স্বমহিমায় আজও উদ্ভাসিত হন নি?

হ্যাঁ, তিনি পুনরায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছেন। সেই কাহিনীও বিচিত্রতায় পূর্ণ।

কলিযুগের তমসাচ্ছন্ন ঘোর পাপী জীবসমূহকে উদ্ধারার্থে দয়াময় শ্রী শ্রী গৌর হরি আবির্ভূত হয়েছিলেন এই নদীয়ায়। তিনি পদ্মাবতীর অভিশাপ মোচন করে এবং তাঁর নিকট কৃষ্ণ প্রেম গচ্ছিত রেখেছিলেন। একদিন মহাপ্রভু পদ্মার তীরে পৌছালে তিনি পদ্মার নিকট কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চিত রেখেছিলেন ভবিষ্যতে তাঁর মহান ভক্ত নরোত্তম দাস ঠাকুরকে তা দেওয়ার জন্য। তখন মূর্তিমতী গঙ্গাদেবী সেখানে উপস্থিত হয়ে মহাপ্রভুকে তাঁর পূর্বের অভিশাপের কথা জানালেন এবং তাঁর অভিশাপ মোচনের উপায়ার্থে কাকুতি মিনতি সহকারে স্তব-স্তুতি করেছিলেন। তখন মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অভয় বাণী দিয়েছিলেন- যেদিন নরোত্তম তোমার জলে স্নান করবে ঠিক সেই সময় আমার দেওয়া প্রেমধন তাকে দান করে তুমি ভগীরথের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।

নরোত্তম দাস ঠাকুরের অবগাহনকালে পদ্মাবতীদেবী উচ্ছসিত হয়ে মহাপ্রভুর গচ্ছিত সেই প্রেম সম্পদ ঠাকুর মহাশয়কে দান করলেন। আর তখনই নরোত্তম দাস ঠাকুরের কৃপায় পদ্মাদেবীর অভিশাপ মোচন হলো। সেই সময় থেকে নরোত্তম দাস ঠাকুরের মতো মহান বৈষ্ণবেরা এবং পূর্বে মহাপ্রভু তার সপার্ষদে পদ্মানদীতে গঙ্গা স্তুতি পাঠ পূর্বক স্নান করেছিলেন। সেই সময় থেকে পদ্মর অভিশাপ মোচন হয় এবং গঙ্গা ও পদ্মা অভিন্ন বলে তাঁর মহিমা প্রচার হয়। এজন্য সেই পদ্মায় স্নান করা গঙ্গার মতোই মহত্ত্বপূর্ণ। গঙ্গায় স্নান করার জন্য হাজার হাজার মানুষ ছুটে চলেন, পদ্মাবতী অভিন্ন নদী হওয়া সত্ত্বেও সেইভবে মানুষ এখনও তাঁর মাহাত্ম্য অবগত নয়। যারা জানেন, তারাই কেবল অভিন্ন গঙ্গা বলে পদ্মা নদীতে স্নান করেন। এমনকি মহাপ্রভুর কৃপায় গঙ্গা নদীতে স্নানের থেকেও পদ্মা নদীতে স্নান করা অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ।

প্রেমতলী বা তমালতলী

এই তমালতলীর সন্নিকটেই নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় পদ্মায় স্নান কালে মহাপ্রেম স্বরূপ সাক্ষাত মহাপ্রভুর আলিঙ্গন লাভ করেন এবং প্রেমধন লাভ করে তিনি কৃষ্ণবর্ণ গাত্র থেকে গৌরবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই তমাল বৃক্ষ আজও সেই প্রেম ধন লাভের স্মৃতিস্বরূপ দণ্ডায়মান। এ জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই স্থানকে প্রেমতলী বলে পরম শ্রদ্ধা করেন এবং তারাও এরকম কৃষ্ণপ্রেম লাভের আশায় তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করেন, প্রদক্ষিণ করেন ও পূজার্চ্চনা করে থাকেন।

ভজনতলী

যে স্থানে বসে নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ভজন করেছিলেন সেই স্থানটিই ভজনতলী নামে খ্যাত। এই স্থানে বসেই তিনি দিনের পর দিন বৃন্দাবনের ভাবে বিভাবিত হয়ে বৃন্দাবনলীলা স্মরণ করতেন এবং সেখানে বসে অনেক প্রার্থনা সঙ্গীত ও প্রেম - ভক্তি চন্দ্রিকার পদ গুলি রচনা করেন ও কীর্তন করেন। এমনকি তিনি এতই ব্রজের ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন যে, তাঁর সেবক সেখানে তাঁকে মহাপ্রসাদ দিয়ে যাওয়ার পরদিনও সেই সেবক সেই মহাপ্রসাদ একই অবস্থায় দেখতে পেত। অর্থাৎ তিনি এতই ভজন নিষ্ঠায় বিভোর থাকতেন যে, বাহ্য আহারাদির প্রয়োজন অনুভব করতেন না। এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই স্থানকে অভিন্ন বৃন্দাবন বা গুপ্ত বৃন্দাবনের ন্যায় শ্রদ্ধা করে থাকেন। ভজনতলী অভিন্ন বৃন্দাবনের মতোই মহিমান্বিত।

খিলনতলী

খিলনতলী শব্দের আভিধানিক অর্থ দন্ত ধাবনের স্থান। জনশ্রুতি আছে যে, এক সময় দন্ত মার্জন শেষে ঠাকুর মহাশয় ঐ দন্ত ধাবনের দণ্ডটি সেই স্থানের মাটিতে পুঁতে রাখেন। তৎক্ষণাৎ সেই দণ্ডটি এক বৃহৎ আম্র বৃক্ষে পরিণত হয় এবং সেই আম্র বৃক্ষ থেকে খুব সুমিষ্ট আম উৎপন্ন হয়। এমনকি তিনি সেই স্থানের দিঘীতে ব্রাহ্মমূহুর্তে স্নান করতেন। স্নানকালে বাঘ বা অন্যান্য হিংস্র জন্তুরা নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি

হিংস্র না হয়ে তাঁর মুখে হরিনাম শ্রবণ করে বা তাঁর অঙ্গজ্যোতি দর্শন করে তাঁর প্রতি মস্তক অবনত করে শ্রদ্ধাপরায়ন হতেন।

ঠাকুর মহাশয়ের আসন

মন্দির চত্বরের ভিতরে যে পাথরে বসে ঠাকুর মহাশয় ভজন করেছেন, সেই পাথরটিকেই ঠাকুর মহাশয়ের আসন বলা হয়। সেই আসনকে ভক্তগণ প্রণাম করেন, প্রদক্ষিণ করেন, সেই আসনের মাঝে নরোত্তম ঠাকুরের দিব্য উপস্থিতিও অনেকে অনুভব করেন। ঠাকুর মহাশয়ের সেই আসনটিকে ভক্তগণ ঠাকুর মহাশয়ের মতোই শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। মন্দিরের দুপাশে দুটি পুকুর রয়েছে যা ঠাকুর মহাশয় শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড বলে বৃন্দাবনের ভাবে স্মরণ ও স্নান করতেন। এজন্য সেই পুকুর দুটিকে আমাদেরও রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মতো শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত। আমরা এ স্থানে এসে কেউ যেন এ ধামের পুকুর বা এই স্থানের অমর্যাদা না করি যাতে আমাদের অপরাধ হয়।

খেতুরী ধামের মাহাত্ম্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ ও মহাজনগণ এই খেতুরী ধামকে তিন ধামের (যেমনঃ বৃন্দাবন, পুরী ও নবদ্বীপ) প্রকাশ বলে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। এই ধামে একরাত্রি যাপন করলে তিন ধামের তিন ধামের রাত্রি যাপনের সমতুল্য ফল লাভ হয়। এই ধামে বসে একমালা জপ করলে এক হাজার মালা জপের সমতুল্য ফল লাভ হয়ে থাকে। যে কোনো সৎ কর্ম

করা হলে তা হাজার গুণ বেশি ফলদায়ক হয়ে থাকে। আর কেউ অপকর্ম করলে তদনুরূপ তাকে হাজার গুণ অপকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। আমাদের সকলের উচিত এই ধামে আগমন পূর্বক ধামের সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করা ও ধামের মহিমা প্রকাশ করা। তাহলে নরোত্তম দাস ঠাকুর ও মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ হবে এবং জীবনান্তে গোলক বৃন্দাবনে গতি লাভ হবে।

বি: দ্র :

খেতুরী ধাম ও প্রেমতলী যাওয়ার পথনির্দেশ :

রাজশাহী থেকে চাঁপাই নবাবগঞ্জের বাইপাস পথে প্রেমতলী বাসষ্ট্যান্ড।

বাসষ্ট্যান্ডের পাশে পদ্মা নদীর তীরে তমালতলী। সেখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরে খেতুরীধাম্ বা গৌরাঙ্গবাড়ী।

ঠাকুর মহাশয়ের তিরোধান তিথিতে সেখানে বিরাট মহোৎসব হয়ে থাকে। সেখানে ইস্কন এর উদ্যোগে বিদেশ থেকেও অনেক ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ঘটে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সেখানে প্রসাদ বিতরণ, পুস্তক বিপণী, গ্রন্থ বিতরণ, ধর্মসভা, পদাবলী কীর্তন, নগরসংকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে থাকেন। এছাড়াও অন্যান্য অনেক ধর্মীয় সংগঠনও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে থাকেন।

প্রেমতলী, ভজনতলী ও খিলনতলীর মাহাত্ম্য কি?
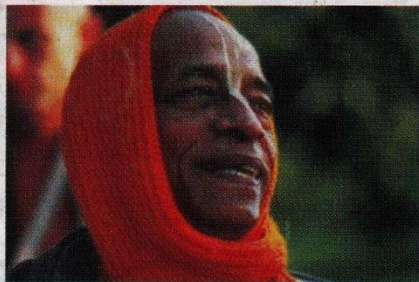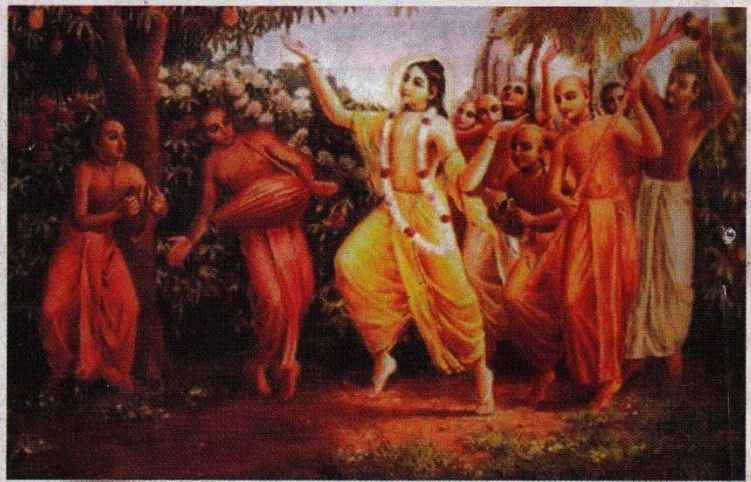
* পদ্মা কার দ্বারা অভিশপ্ত হন?

* শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের কৃপায় পদ্মা কিভাবে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গঙ্গার থেকেও মহাত্ম্যপূর্ণ?